প্রযুক্তি যখন নীরব ঘাতক

সুমন ইসলাম

আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা হাতের বড় গুণে অন্ধ করতে পারে না। কারণ, এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ক্যালকুলেটরে। তাই যেকোনো হিসেব মুখে মুখে মিলিয়ে ফেলার কথা তারা চিন্তাও করতে পারে না। এ কাজে পুরোপুরি এরা যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। মোবাইল ফোন ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারে এমন মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। কমপিউটার কিংবা ল্যাপটপের ওপর নির্ভরশীলতাও বেড়ে গেছে বহুগুণে। এসব নেই তো চারদিক অন্ধকার। দুর্বিষহ মানুষের জীবন। অথচ একটা সময় ছিল যখন মানুষ এগিয়ে গেছে কোনো যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই। যন্ত্র ছাড়া এখন তাবা যায় না একটি মুহূর্তও। যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। নীরব ঘাতক হয়ে উঠছে এগুলো। এ বিষয়ে সচেতনতা এখনই জরুরি। নইলে মানবসভ্যতায় নেমে আসবে ভয়াবহ বিপর্যয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেমন লালন প্রাণী ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমন যান্ত্রিক বিপর্যয়ে হয়তো বিলুপ্ত হবে মানুষ।

বিষয়টি নিয়ে যে কেউ ভাবছেন না, তা নয়। অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী আবিষ্কারের পাশাপাশি গবেষণা করে চলেছেন সম্ভাব্য আবিষ্কারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে। মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তা নিয়েও চলছে গবেষণা। লড়াইও হচ্ছে তাদের মধ্যে। কেউ বলছেন, মোবাইল ফোনের বিকরণ বা রেডিয়েশন ক্ষতিকর নয়, আবার কেউ প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন ভয়াবহ ক্ষতির বিষয়টি। তারপরও ব্যবহার থেমে নেই। সব প্রযুক্তিই থাকছে পকেটে। অনেকেরই সাফল্যের মূলে রয়েছে ওই সব প্রযুক্তিপণ্য। তাই ক্ষতির কথা বললেই তো আর এসব প্রত্যাখ্যান করা চলে না। বের করতে হবে ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার উপায়। উদ্ভাবন করতে হবে ক্ষতিবিরোধী প্রযুক্তি।

প্রযুক্তি যে জীবনে গতি এনে দিয়েছে, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। একটা সময় ছিল, যখন জীবন চলত ধীরে। এখন তা নেই। প্রতিটি মানুষ প্রযুক্তির স্পর্শে পেয়েছে গতি। এই গতি তাদের ঠিক কোথায় নিয়ে যাবে তা এরা জানে না। প্রযুক্তির কল্যাণে অনেক কিছুই করা যাচ্ছে, যা হয়তো আগে ভাবাই যেত না। মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ থাকলে যেকোনো স্থানে বসেই সেরে নেয়া যাচ্ছে দাপ্তরিক কাজকর্ম। দেয়া যাচ্ছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। অনেক অফিসেই এখন কর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়, বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় কাজটি ফোন না ই-মেইলে অফিসে পৌঁছে দিতে পারলেই যথেষ্ট। তাই অফিস স্পেসও কম লাগছে, শক্তু খাতে খরচ কমছে, অন্যান্য খরচও কমে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে ইতোমধ্যেই এ নিয়ম চালু হয়ে গেছে। শত শত মাইল দূর থেকে অফিসে আসতে হচ্ছে না। প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই সেরে ফেলা যাচ্ছে অফিসের কাজকর্ম। এতে শ্রমঘণ্টার অপচয় এবং সার্বিক ব্যয় কমছে। নৈশ কিংবা মধ্যাহ্নভোজের সময়ও করা যাচ্ছে ই-মেইল বিনিময়, যোগাযোগ রাখা যাচ্ছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।

প্রযুক্তির কল্যাণে এমন সব মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা যাচ্ছে, যা আগে কখনই সম্ভব হতো না। এজন্য মোবাইল ফোনের পাশাপাশি ধন্যবাদ পাবে ফেসবুকের মতো সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইটগুলো। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকা বন্ধু বা স্বজনদের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রক্ষা করা যাচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে। যথাযথ প্রযুক্তি হাতে থাকায় জীবন চলছে এখন স্বাধীনভাবে এবং কমে গেছে শ্রমঘণ্টার অপচয়।

এই যে প্রযুক্তির এত ইতিবাচক দিক, তারপরও সাবধান না হয়ে উপায় নেই। কারণ ওই সব প্রযুক্তিপণ্য আপনাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ বা কমপিউটার ব্যবহারের কারণে মাথা এবং পিঠে ব্যথা হয়ে ওঠে অনিবার্য। এ জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ চিকিৎসা নেয়ার। নইলে ওই ব্যথা হয়ে উঠতে পারে বিপর্যয়ের কারণ। সঠিক নিয়মে চেয়ারে বসা এবং কিছু শরীরচর্চা ওই ব্যথা কিছুটা কমাতে পারে বৈকি, কিন্তু নির্মূল সহজ নয়।

ওয়্যারলেস প্রযুক্তির বিকরণ নিয়ে পরস্পরবিরোধী গবেষণার ফল পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলছেন, ওই বিকরণ ক্ষতিকর নয়, আবার কেউ কেউ বলছেন, মস্তিষ্কের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সাদা চোখে এটা স্পষ্ট, মেকোনো ধরনের বর্শিত বিকরণেই ক্ষতিকর। তবে ক্ষতির মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। তাই আমরা মোবাইল ফোনে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যাচ্ছি, তার বিকরণ প্রভাব মস্তিষ্কে পড়তে বাধ্য। ওই বিকরণে মস্তিষ্কের সেল বা কোষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং টিউমারও হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই জীবনকে গতিশীল করতে গিয়ে আমরা কি জীবনের চূড়ান্ত সর্বনাশটাই করছি না? এছাড়া রয়েছে প্রজনন স্বাস্থ্যের ঝুঁকির বিষয়টি। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার পুরুষের প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। শুক্রাণু নিষ্ক্রিয় হয়ে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। তাহলে মোবাইল বা ওয়্যারলেস ফোনকে কি আশীর্বাদ বলা চলে? নিশ্চয়ই নয়।

প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে ঘরে বা যেকোনো স্থানে বসে কাজ করতে হয় বলে মানুষের চলাফেরা এবং শরীরচর্চা কমে গেছে। তাই বিশ্বেই বেড়ে যাচ্ছে স্থূল মানুষের সংখ্যা। নানা রোগজীবাণু বাসা বাঁধছে তাদের শরীরে। ই-মেইল বা ওয়েবসাইট জীবনে গতি আনছে ঠিকই, বিনিময়ে দেহ যাচ্ছে বিপর্যয়ের দিকে। দীর্ঘক্ষণ মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে চোখের বারোটা তো বেজেছে আগেই।

ভালোবাসাও হচ্ছে মোবাইল ফোন কিংবা ওয়েবসাইটে চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে। তাই আবেগ তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। ভালোবাসা হয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক। প্রেম করতে কেউ আর বাইরে যাচ্ছে না। অনলাইনে এসব করতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে উঠছে না। তাই যাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা হু-প্রাকৃতিক কারণেই সম্ভব নয়, তাদের সাথে অনলাইন নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা চলবে। কিন্তু যাদের সাথে সামনাসামনি দেখা হওয়া সম্ভব, তাদের ক্ষেত্রে অনলাইন যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দেয়া ঠিক হবে না। কারণ, মানুষের সরাসরি সঙ্গও জীবনের জন্য জরুরি। মনোবিজ্ঞানীরা এমনটাই বলছেন।

পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টা নিয়েও ভাবনার প্রয়োজন। প্রতিদিন যে কোটি কোটি প্রযুক্তিপণ্য তৈরি হচ্ছে, তা এক সময় পরিণত হচ্ছে ই-বর্জ্যে। ইদানীং কিছু কিছু ই-বর্জ্য পুনঃউৎপাদনে ব্যবহৃত হলেও বিপুল পরিমাণ বর্জ্য রয়ে যাচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য বয়ে আনছে মারাত্মক বিপর্যয়। এই বিপর্যয় থেকে পরিবেশ তথা পৃথিবী ও তার মানুষকে রক্ষা করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে এখনই। নইলে সর্বনাশ রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

ভারতের চণ্ডিগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় মোবাইল ফোন রেডিয়েশনের ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। গবেষকরা জানান, তারা গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন মোবাইল ফোনের বিকরণের কারণে মৌমাছিরা তাদের দিক হারিয়ে ফেলছে এবং এক পর্যায়ে মারা যাচ্ছে। তারা মৌমাছির দুটি বসতিতে পরীক্ষা চালিয়েছেন। একটিতে রাখা হয়েছিল দুটি মোবাইল ফোন এবং অন্যটিতে ডামি ফোন। যে বসতিতে আসল ফোন রাখা হয়েছিল সেখানে দেখা যায় মাত্র তিন মাসের মধ্যে মৌমাছিরা মধু উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। সেখানের মোবাইল ফোন দিনে মাত্র দুইবার ১৫ মিনিট করে খোলা রাখা হয়েছিল। আর এ কারণেই এ বিপর্যয়। এখন ভাবা দরকার, আমরা যারা প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ধরে মোবাইল ফোনে কথা বলি তাদের ব্রেনের অবস্থাটা কী হতে পারে। অভিযোগ রয়েছে, ওয়্যারলেস ফোনের টাওয়ারের বিকরণের কারণে নারকেলসহ বিভিন্ন গাছ মরে যাচ্ছে, ফল উৎপাদনও ক্রমাগত কমে যাচ্ছে।

এতসব নেতিবাচক দিক সত্ত্বেও আমরা কি প্রত্যাখ্যান করব নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্য? নিশ্চয়ই নয়। আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে ওই সব নেতিবাচক দিক প্রতিরোধ করা যায় তা নিয়ে। প্রযুক্তি আমাদের যেমন দিয়েছে গতি, তেমনি তার কিছু নেতিবাচক প্রভাবও আমাদের মেনে নিতে হবে। এখন বিজ্ঞানের কাজ হবে ওই সব নেতিবাচক দিক থেকে কিভাবে মানুষকে উদ্ধার করা যায় তা নিয়ে জোর গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। আমরা সেই দিনের প্রত্যাশায়।

ফিডব্যাক : sumonislam7@gmail.com